বাংলাদেশে ইসলাম

খ্রিষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে তথা ৬১০-৬৩২ খৃষ্টাব্দে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅতকালে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ইসলাম এসেছিল আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমে *(আল-ইক্বদুছ ছামীন ১/১৭ পৃ.)*। বাংলাদেশের 'রাহ্মী' (رهمى) বংশীয় রাজা ইসলামের নবী-কে এক কলস আদা (زنجبيل) উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন বলে একটি হাদীছ থেকে জানা যায় *(হাকেম হা/৭১৯০, ৪/১৫০; আল-ইক্বদুছ ছামীন ১/২৪ পৃ.)*। নাফ নদীর তীরবর্তী সুউচ্চ ইয়োমা (Yoma) পর্বতমালা বেষ্টিত বর্তমান মিয়ানমারের রাখাইন বা আরাকানের ২২ হাযার বর্গমাইল এলাকা প্রাচীন রাহমী বা 'রামু' রাজ্যভুক্ত এলাকা ছিল বলে ধারণা করা হয়। ১৪৩৪ থেকে ১৬৪৫ খৃ. পর্যন্ত দু'শো বছরের অধিক কাল যাবৎ ১৭ জন মুসলিম রাজা স্বাধীন আরাকান রাজ্য শাসন করেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তখন বাংলা ভাষার চরমোন্নতি সাধিত হয়। কবি আলাওল, দৌলত কাযী, মরদান শাহ প্রমুখ কবিগণ আরাকান রাজসভা অলংকৃত করেন। আজকে যেমন বাংলা ভাষার রাজধানী হ'ল ঢাকা; সেযুগে তেমন বাংলা ভাষার রাজধানী ছিল রোসাঙ্গ। বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী আকিয়াব ছিল তখন শ্রেষ্ঠ বন্দর নগরী। যা চাউল রফতানীর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং এখান থেকেই বাংলাদেশে চাউল রফতানী হ'ত। রামু বর্তমানে কক্সবাজার যেলার অন্তর্ভুক্ত একটি উপযেলার নাম।

চট্টগ্রাম বন্দরের সাথেই আরব বণিক ও মুবাল্লিগদের প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাদের প্রচারের ফলে স্থানীয় বহুলোক ইসলাম কবুল করেন। বর্তমানে ৮ বর্গ কিলোমিটারের 'সেন্টমার্টিন' প্রবাল দ্বীপটি প্রথমে আরব বণিকরাই আবিষ্কার করেন এবং নাম দেন 'জাযীরাহ' অর্থাৎ দ্বীপ। তারা সেখানে বসতি স্থাপন করেন। পরে 'নারিকেল জিঞ্জিরা' অতঃপর ১৯০০ সালে চট্টগ্রামের যেলা প্রশাসক মার্টিনের নাম অনুসারে দ্বীপটির নামকরণ করা হয়। এরপর ধীরে ধীরে এটি বাইরের মানুষের কাছে 'সেন্ট মার্টিন' দ্বীপ নামে পরিচিতি লাভ করে। এখানে কোন খ্রীষ্টান জনবসতি এবং গীর্জা না থাকায় একজন পাদ্রীর নামে দ্বীপটির নামকরণ সঠিক ইতিহাস নয় বলেই মনে হয়। আধুনিক গবেষণা মতে অনুমান করা হয় যে, আরব ও স্থানীয় মুসলিমরা খ্রিষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দী হ'তে চট্টগ্রামের উপকূলবর্তী এইসব এলাকা সমূহে বসতি স্থাপন করে তাদের নির্বাচিত আমীরের অধীনে শরী'আত মোতাবেক পরিচালিত হ'তেন এবং এদেশীয়দের মধ্যে প্রচারকার্য চালাতেন *(ড. এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম)*। আরাকানে ইসলাম আগমনের প্রায় দেড়শ' বছর পর ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দের পর তিব্বত হয়ে মিয়ানমারে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবেশ ঘটে। ব্রাহ্মণ ও উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এবং বাধ্যগতভাবে বিতাড়িত হয়ে বৌদ্ধরা তাদের আদি বাসভূমি ভারত ছেড়ে থাইল্যাণ্ড, শ্রীলংকা, তিব্বত, মিয়ানমার, চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে অভিবাসী হয়।

৬০১ হিজরী তথা ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কী মামলূক সেনাপতি বখতিয়ার খিলজীর মাধ্যমে বাংলার অংশবিশেষ লাখনৌতি রাজ্য জয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বৌদ্ধ ও হিন্দু সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রগুলিতে ইসলাম পৌঁছে গিয়েছিল বলে অনুমান করা চলে। জয়পুরহাটের পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে খলীফা হারূনুর রশীদের আমলের (১৭০-১৯৩ হি./৭৮৬-৮০৯ খৃ.) ১৭২ হিজরীতে মুদ্রিত প্রাচীন আরবী মুদ্রার প্রাপ্তি এ মতকে সমর্থন করে। কোচ রাজার আমলে ৪৪৫/১০৫৩ খ্রিষ্টাব্দে শাহ মুহাম্মাদ সুলতান রূমী ময়মনসিংহের নেত্রকোণা যেলার মদনপুরে আগমন করেন এবং রাজাসহ স্থানীয়রা ইসলাম কবুল করেন। ১১১৯ খ্রিষ্টাব্দের দিকে রাজা বল্লাল সেনের আমলে ঢাকার বিক্রমপুর এলাকায় 'বাবা আদম' নামে একজন ধর্মপ্রচারক আসেন এবং অনুচরবৃন্দসহ বল্লাল সেনের হাতে নিহত হন। মূর্তিনাশক শাহ নেয়ামাতুল্লাহ 'বুতশিকন' এই সময়ে ঢাকার দিলকুশাকে কেন্দ্র করে ইসলাম প্রচার করেন। লক্ষণ সেনের রাজত্বের (১১৮০-১২০৫ খৃ.) শেষদিকে তুর্কী বিজয়ের প্রাক্কালে জালালুদ্দীন তাবরেযী বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করেন। রাজা পরশুরামের সময়ে সৈয়দ সুলতান মাহমূদ মাহীসওয়ার বল্খী খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে বগুড়ার মহাস্থানে আগমন করেন ও যুদ্ধে পরশুরাম পরাজিত ও নিহত হন। এই শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাক্বীউদ্দীন আল-'আরাবীর নেতৃত্বে রাজশাহীর Mahisun বা সম্ভবতঃ মাহিসন্তোষে (ধামুইরহাট, নওগাঁ) ইসলামী শিক্ষার যে কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এঁদের মাধ্যমে বাংলার অভ্যন্তরে ইসলাম প্রচারিত হ'লেও তাঁদেরকে ইল্মে হাদীছের শিক্ষাদাতা হিসাবে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা চলে না।

তুর্কী বিজয়ের পর মধ্য এশিয়া থেকে বহু ভাগ্যান্বেষী মুসলিম ও মরমী সাধকের এদেশে আগমন ঘটে। তুরস্ক থেকে ৭০৩ হিজরীতে সিলেটে আসেন শাহ জালাল (৬৬৯-৭৪৭ হি.) এবং ৮২১ হিজরীতে যশোরের বারো বাজার ও পরে বাগেরহাটে আসেন খান জাহান আলী (৭৭০-৮৬৩ হি.)। এইসব সাধক ও সেনাপতিগণ সকলেই যে কুরআন-হাদীছে পারদর্শী ছিলেন, একথা বলার উপায় নেই। বরং এটাই ঠিক যে, রাজানুকূল্য লাভের জন্য কিংবা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য ও সাথে সাথে এইসব দরবেশদের কেরামত ও উন্নত চরিত্রে আকৃষ্ট হয়ে এদেশীয় বৌদ্ধ ও হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম কবুল করে। এসময় ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতির সাথে মিশ্রিত হয় তুর্কী, আফগান, পাঠান, মোঙ্গল ও স্থানীয় বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতি, যা মুসলিম সমাজকে কুরআন-হাদীছের প্রকৃত (pure) ইসলাম থেকে লৌকিক (popular) ইসলামে অভ্যস্ত করে তোলে।

তাই বলা চলে যে, মধ্য এশিয়া থেকে উত্তর ভারতের দিল্লী হয়ে তুর্কী-ঈরানী সাধক-দরবেশদের মাধ্যমে ও রাজশক্তির ছত্রছায়ায় পরবর্তীতে বাংলাদেশে যে ইসলাম প্রচারিত হয়, তা ছিল মূল আরবীয় ইসলাম হ'তে বহুলাংশে পৃথক *(সুলায়মান নাদভী, 'আরব ওয়া হিন্দ কে তা'আল্লুক্বাত' ১৮৭-৯০ পৃ.)*। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, 'জেনে রাখ হে পাঠক! ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান নির্দিষ্টভাবে কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না'। .. কোন সমস্যা সৃষ্টি হ'লে লোকেরা যেকোন আলেমের নিকট থেকে ফৎওয়া জেনে নিত। এ ব্যাপারে কারু মাযহাব যাচাই করা হ'ত না' *(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৫২-৫৩ পৃ.)*। অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর যামানা থেকে চার মাযহাব চলছে এবং এটি মান্য করা ফরয বলে যে কথা বলা হয়ে থাকে, তার কোন ভিত্তি নেই।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, সরাসরি আরব বণিক ও মুহাদ্দিছগণের প্রচারিত ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত দক্ষিণ ভারত তথা ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা প্রভৃতি দ্বীপ অঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমান পরবর্তীতে 'শাফেঈ' বা মুহাম্মাদী ও আহলেহাদীছ হিসাবে পরিচিত হয়েছেন। পক্ষান্তরে তুর্কী বিজেতা হানাফী শাসক সম্প্রদায় ও ছূফী দরবেশদের প্রভাবে বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান হানাফী ও পীরপন্থী হয়ে যায় *(ড. এবনে গোলাম সামাদ, 'বাংলাদেশে ইসলাম' ১৩, ৪২ পৃ.)*। এই সময় শিরক ও বিদ'আতের আধিক্য দেখা দেয়। ইসলামের নামে অসংখ্য বিজাতীয় আক্বীদা ও প্রথায় মুসলমান অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। 'বাংলায় চলতি কথায় কোন কিছুর তত্ত্ব বা সন্ধান না পাওয়া গেলে বলা হয়- 'বিষয়টার হদিস মিলছে না'। এ থেকে সম্ভবতঃ অনুমান করা চলে, এদেশের সমাজ জীবনে এক সময় ছিল হাদীছের প্রভাব' *(ঐ, 'বাংলাদেশে ইসলাম' পৃ. ৪০, টীকা-৩)*।

খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক হ'তে ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ অবক্ষয় যুগে বাংলাদেশে যে সকল মুহাদ্দিছ ও শাসকগণ ইল্‌মে হাদীছের প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে হাদীছ ভিত্তিক ইসলাম প্রসারে অবদান রাখেন, তাঁদের মধ্যে সোনারগাঁও হাদীছ শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা মুহাদ্দিছ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বুখারী (মৃ. ৭০০ হি./১৩০০ খৃ.)-এর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখের দাবী রাখে। ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম তিনিই প্রথম ভারতবর্ষে নিয়ে আসেন। সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ৩৩ বৎসর (৬৬৭-৭০০ হি.) যাবৎ ছহীহায়েনের দরস দানের ফলে এদেশের ও বিদেশের অগণিত জ্ঞানপিপাসু ছাত্র হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ায় উদ্বুদ্ধ হন *('শাওক নীমবী : হায়াত ওয়া খিদমাত' ১৫ পৃ.)*। এদিক দিয়ে বিচার করলে বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার সর্বাধিক ভাগ্যবান দেশ বলা চলে'।

অতঃপর দিল্লীর আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদ (১৭৭৯-১৮৩১ খৃ.), সৈয়দ নযীর হোসাইন দেহলভী (১৮০৫-১৯০২), মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব দেহলভী (১৮৬৬-১৯৩৩ খৃ.), পাটনার মাওলানা বেলায়েত আলী (১৭৯০-১৮৫২), এনায়েত আলী (১৭৯৩-১৮৫৮), নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১৮৩২-১৮৯০), বারাসাতের সৈয়দ নিছার আলী তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১), ফরিদপুরের হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) প্রমুখদের সংস্কার আন্দোলন উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে সাড়া জাগায়। অতঃপর বর্তমানে সাংগঠনিকভাবে বাংলাদেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র যে গণজোয়ার দেখা যাচ্ছে, তা মূল আরবীয় ইসলামের দিকে মানুষের ফিরে যাওয়ার উদগ্র বাসনার ফলশ্রুতি মাত্র। আল্লাহ মানুষের হৃদয়ের এই গভীর আকুতি অব্যাহত রাখুন এবং আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

॥ বিস্তারিত দ্রঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ডক্টরেট থিসিস (রাবি, ১৯৯২) প্রকাশ : হা.ফা.বা. ১৯৯৬ ॥

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৭৬০৫২৫, ০১৯১৬-১২৫৫৮৩
প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৪৪১ হি./১৪২৬ বাং/মার্চ ২০২০ খৃ.।